নতুন নির্বাচন কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২)

বহু জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাবেক সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, সাবেক যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জাবেদ আলী ও সাবেক দায়রা জজ মোহাম্মদ শাহনেওয়াজকে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ নিয়োগ দেওয়া হয়, যদিও কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশ বিতর্ক রয়েছে। প্রশ্ন রয়েছে নিয়োগের স্বচ্ছতা নিয়ে।

আমরা নবগঠিত নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে কমিশনের সদস্যদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাঁদের সামনের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে। তুলে ধরতে চাই তাঁদের জন্য অপেক্ষমান সুযোগগুলো। আমরা কমিশনকে আমাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাসও দিতে চাই, অবশ্য যদি কমিশন সততা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে।

প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ

কমিশনের সামনে সবথেকে বড় প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ হলো এর সংখ্যা। অতীতে কোনো কমিশনেই তিনজনের বেশি সদস্য ছিলেন না। এই তিনজনের মধ্যেও অনেক সময় দ্বন্দ্ব লেগে থাকত। এমন দ্বন্দ্বের সবথেকে সাম্প্রতিক উদাহরণ হল গত চারদলীয় সরকারের প্রথমদিকে বিচারপতি আজিজের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন। আমাদের দেশে যৌথভাবে কাজ করার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। নবনিযুক্ত কমিশনারদের সবাই বয়স্ক, অভিজ্ঞ এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই অনেক বিষয়েই সুস্পষ্ট মতামত থাকা স্বাভাবিক। দুই-তিনজনের মতামতের মধ্যে সমন্বয় করা যত সহজ – যা সম্ভব হয়েছিল বিগত নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে – পাঁচজনের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি দুরূহ। তাই পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বর্তমান কমিশনের ক্ষেত্রে একটি বড় ঝুঁকি হল অনেক বিষয়ে তাদের মধ্যে সম্ভাব্য মতৈক্য। তবে যেহেতু কমিশনকে বিরোধী দলের চাপের মুখে কাজ করতে এবং কাজের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করতে হবে, ফলে এ সমস্যা তেমন প্রকট আকার ধারণ নাও করতে পারে, যা আমাদেরও কাম্য।

নবনিযুক্ত কমিশনারদের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো তাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ড। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সচিব এবং অন্য একজন অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করলেও, কমিশনের অন্য সদস্যগণ কর্মজীবনে সর্বোচ্চ যুগ্ম সচিব পদমর্যাদায় ছিলেন। অর্থাৎ পাঁচজনের মধ্যে চারজনই সচিব পদমর্যাদার নিচের হওয়ায় কারণে সরকার কমিশনের গুরুত্ব খর্ব করেছে বলে অনেকের ধারনা, যার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। প্রসঙ্গত, পুনর্গঠিত কমিশনে একজনও নারী এবং সমাজের অন্য ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণেও আমরা অসন্তুষ্ট।

নির্বাচন কমিশনের অন্য একটি চ্যালেঞ্জ হল তাঁদের অপরিচিতি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব রকিবউদ্দিন আহমদ ছাড়া অন্য চারজন কমিশনার সম্পর্কে বলতে গেলে দেশের অধিকাংশ মানুষ তেমন কিছুই জানে না। সৎ ও যোগ্য সচিব হিসেবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সুনাম রয়েছে। অন্য দুইজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা সম্পর্কে শোনা যায় যে, কর্মজীবনে তাঁরা সততার পরিচয় দিয়েছেন। তবে তাঁরা চাকুরি জীবনে বঞ্চিত ছিলেন বলে কিছু কানাঘুষা রয়েছে এবং অনেকের আশঙ্কা যে এ বঞ্চনার অভিজ্ঞতা তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, অতীতের ন্যায় নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তাঁরাও সততার পরিচয় দেবেন এবং নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করবেন।

প্রক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জ

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান। আর এজন্য প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা এবং দক্ষতার বাইরেও, যথাযথ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বা সিস্টেম, বিশেষত একটি যুগোপযুগি আইনি কাঠামো এবং আইনের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রদ্ধাশীলতা। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনসংক্রান্ত অনেকগুলো আইন আমাদের রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে এসব আইনের আরও সংস্কার প্রয়োজন।

জাতীয় নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলো হলো: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (আরপিও); ভোটার তালিকা আইন, ২০১০; নির্বাচনী এলাকা সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০১০; রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১; জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪; নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে আচরণবিধিসহ আরও অনেকগুলো বিধিমালা। উপরন্তু, স্থানীয় সরকারের সবগুলো আইনেই নির্বাচনী বিধান রয়েছে। গত নির্বাচন কমিশন এসব আইনের নির্বাচনসংক্রান্ত বিধিবিধানের অনেক সংস্কার করেছে। তাদের নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে আরপিও এবং ভোটার তালিকা আইনে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সংস্কার কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে।

পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের সামনে আরও বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো কমিশনের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা। অনেকেরেই স্মরণ আছে যে, অতীতে কমিশনের সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে সম্পর্ক '*নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯*' এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা হয়। তবে আইন করে স্বাধীনতা দেয়া যায়, কিন্তু সে স্বাধীনতা 'assert' বা প্রয়োগ করতে হয়। বিগত কমিশন বহু প্রতিকূলতার মুখেও স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন এবং মেরুদণ্ডের শক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। আশাকরি নতুন কমিশন সে ঐতিহ্য বজায় রাখবে।

অনেকেরই স্বরণ আছে যে, চার দলীয় জোট সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশন একটি চরম বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। অনেকের মতে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে কমিশনই সবথেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিগত কমিশন তাদের অনমনীয়তা, নিরপেক্ষতা ও সফলতার মাধ্যমে জনগণের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। কমিশনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এ আস্থাশীলতার অবস্থান ধরে রাখাই নতুন কমিশনের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিগত কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব

বিগত নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে করা আইনি সংস্কার গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরেপেক্ষ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সংলাপ ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিগত কমিশন বিদ্যমান আইনগুলোর, বিশেষত আরপিরও সংশোধনের লক্ষ্যে অনেকগুলো সুস্পষ্ট প্রস্তাবও রেখে গিয়েছে। প্রস্তাবগুলো হলো:

(১) কোনো আদালত ও ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পলাতক ঘোষিত, মনোনয়নপত্র বা হলফনামায় সজ্ঞানে মিথ্যা তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপনকারীদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়েছে (ধারা ১২)।

(২) প্রাথমিকভাবে কোনো দল থেকে একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হলে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আগেই দল থেকে যে কোনো একজনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে (ধারা ১৬)। এক্ষেত্রে দল থেকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন পাওয়া বাকি প্রার্থীদের প্রার্থীতা বাতিল হয়ে যাবে। (নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীর দৌরাত্ম কমানোর লক্ষ্যে এ প্রস্তাব করা হলেও এর মাধ্যমে মনোনয়ন বানিজ্যের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে বলে আমাদের আশঙ্কা।)

(৩) জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে (২৬ ধারা)। তবে নির্বাচনে দুইটি পদ্ধতি ব্যবহারের পথই, বর্তমান পদ্ধতি ও ইভিএম খোলা রাখা হয়েছে।

(৪) নির্বাচনী ব্যয়সীমা ১৫ লাখের পরিবর্তে ২৫ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে (৪৪ই ধারা)। আরও প্রস্তাব করা হয়েছে দৈনিক নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পরিবীক্ষণের। এছাড়াও প্রত্যেক প্রার্থী বা তার এজেন্টকে প্রতি সাত দিন অন্তর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৫) দলীয় মনোনয়নে ৫১ থেকে ১০০ জন সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এমন দলের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ৭৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে এককোটি ৫০ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে (৪৪ঈ ধারা)।

(৬) আরপিও'র ৭৩, ৭৮, ৭৯ ও ৮০ ধারায় নির্ধারিত নির্বাচনী অপরাধের শাস্তি কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে এগুলোর বিচার নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়।

(৭) হলফনামায় মিথ্যা তথ্য প্রদানের দায়ে, নির্বাচন পরবর্তীকালে সংসদ সদস্যপদ বাতিলের বিধান যুক্তের প্রস্তাব করা হয়েছে (৯০ঋ ধারা)।

(৮) সংসদ ভেঙে যাওয়ার দিন থেকে পরবর্তী সরকার গঠন পর্যন্ত সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পূর্বালোচনা ব্যতীত নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত যেন নিতে না পারে সে প্রস্তাব করা হয়েছে (ধারা ৪৪ই)। (এ প্রস্তাবটি সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে না এবং নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ ক্ষমতার পৃথকীকরনের নীতিমালার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে।)

এছাড়াও বিদায়ী নির্বাচন কমিশন প্রধান *নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইন* শিরোনামের একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করে রেখে গিয়েছে। আইনের খসড়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। একটি অনুসন্ধান কমিটির এবং কমিটির সুপারিশ সংসদের কার্যউপদেষ্টা কমিটির বিবেচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও নিয়োগের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনের এ খসড়া এবং বিদ্যমান আইন সংশোধনের লক্ষ্যে উপরিউক্ত প্রস্তাবসমূহ নতুন কমিশনের কাজকে অনেক সহজ করে দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অতিরিক্ত সংস্কার প্রস্তাব

নির্বাচন কমিশনের উপরিউক্ত প্রস্তাবের সঙ্গে কতগুলো নতুন বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন বলেও আমরা মনে করি:

(১) গত জাতীয় নির্বাচনে 'না ভোটে'র বিধান কার্যকর থাকলেও, নবম জাতীয় সংসদ আরপিও থেকে এটি বাদ দেয়। আমরা না ভোটের বিধান আরপিওতে সংযোজিত করার প্রস্তাব করছি।

(২) গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সংশোধিত আরপিও'র বিধানানুযায়ী, নিবন্ধিত দলের তৃণমূলের কমিটিগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি প্যানেল থেকে দল কর্তৃক মনোনয়নের বিধান ছিল। কিন্তু নবম সংসদ এটি রহিত করে প্যানেলটি শুধু বিবেচনায় নেওয়ার

বিধান আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমে দলের তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রভাবিত করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়, যদিও এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য নেই। এছাড়াও এর মাধ্যমে মনোনয়ন বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাই আমরা আরপিও'র ৯০ই(১)(ন)(রা)-এর সংশোধন করে এ ক্ষমতা দলের সদস্যদের ফিরিয়ে দেওয়ার এবং তাদের প্রতি দলের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছি। আরেকটি বিকল্প প্রস্তাব – তৃণমূলের নেতাকর্মীরাই দলের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে।

(৩) আমাদের উচ্চ আদালত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের আদালত প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে বাক্ স্বাধীনতা তথা মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়াও পিইউসিএল ও অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলার রায়ে [(২০০৩) ৪ এসসিসি] অদালত স্বীকৃতি দিয়েছে যে, ভোটারদের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না, নিরপেক্ষও না। তবে তথ্য দিলেই হবে না, তথ্য সঠিক ও বিভ্রান্তিমুক্ত হতে হবে। তাই নির্বাচন কমিশনের চূলচেরাভাবে তথ্যের সঠিকতা যাচাই করারা লক্ষ্যে আরপিও সংশোধনের আমরা প্রস্তাব করছি। আর সৎ-যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত না হয়ে আসলে নির্বাচন অর্থবহও হবে না।

(৪) সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য হলো এগুলো ভোটারদের কাছে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের দিন থেকে নির্বাচনের দিনের সময়ের ব্যবধান মাত্র সপ্তাহ দুই। এ সীমিত সময়ের মধ্যে আনুমানিক দুই হাজার প্রার্থীর তথ্য সংকলিত করে ভোটারদের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া প্রায় অসম্ভব কাজ, যদিও গত নির্বাচনের সময় 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাব্রতীরা এ দুঃসাহসিক কাজটি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু কাজটি নির্ভুল ও আরও ভালভাবে করার জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব হতে পারে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য প্রার্থীগণ হলফনামা ও আয়কর রিটার্ণসহ কমিশনে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিপ্রায় লিখিতভাবে (ইনটেন্ড টু রান) দাখিল করবে, যা কমিশন প্রকাশ করবে। অথবা রাজনৈতিক দলও যাদেরকে মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করছে, তাদের তথ্যও দল প্রকাশ করতে পারে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিজেরা তা করতে পারে। এর ফলে তথ্য যাচাই-বাছাই করার সময় পাওয়া যাবে।

(৫) এছাড়াও আমরা মনোনয়নপত্র, হলফনামা, নির্বাচনের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাবসহ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টগুলো ইলেকট্রনিক্যালি (অন-লাইনে) জমা দেওয়ার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি। সুপারিশ করি 'কাউন্টার এফিডেভিট' বা বিরুদ্ধ হলফনামা প্রদানের বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করার। প্রসঙ্গত, বিরুদ্ধ হলফনামা প্রদানের বিধানটি নির্বাচন কমিশনের ১৭/১১/০৮ তারিখে জারি করা পরিপত্র- ৮ দ্বারা গত সংসদ নির্বাচনে কার্যকর করা হয়।

(৬) জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪ সংশোধন করে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আরপিও'র ১২ ধারার অন্তর্ভুক্ত অনুরূপ হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের কপি জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। হলফনামার ছকটিও নতুন করে তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও আমরা মনে করি।

(৭) আরপিও'র ১২ ধারা অনুযায়ী, ইস্তফাদানকারী বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ইস্তোফাদানের বা অবসরের পর তিনবছর অপেক্ষা, মনোনয়ন লাভের জন্য দলে যোগদানের পর তিনবছর অপেক্ষার বিধান রয়েছে। তিনবছর অপেক্ষা করার এ বিধানকে কার্যকর করতে হলে দলের পক্ষ থেকে তাদের সদস্যের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

(৮) বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্বও কমিশনের ওপর অর্পন করার সুপারিশ করছি।

(৯) রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব (অনুচ্ছেদ-১১৯)। এর জন্য কমিশনকে স্বাধীনতা দিতে হবে, বিশেষত আর্থিক স্বাধীনতা, যাতে প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে না হয়। এজন্য কমিশনের ব্যয়কে 'সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয়' হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক। তবে এ জন্য সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

(১০) নির্বাচনী অপরাধের প্রায় সবগুলোরই উৎস রাজনৈতিক দল, তাদের মনোনীত প্রার্থী ও দলের নেতাকর্মীরা। দল ও দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাই মনোনয়ন বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, টাকা দিয়ে ভোট কেনে, পেশিশক্তি ব্যবহার করে এবং আরও অনেক ধরনের অসদাচারণে লিপ্ত হয়। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দলের ব্যাপক সংস্কার করা আবশ্যক, যা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টি আলোচনার মধ্যেই নেই।

(১১) নির্বাচনে টাকার খেলা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সবথেকে বড় হুমকি। বর্তমানে নির্বাচনী ব্যয়সীমা ১৫ লাখ টাকা, যা ২৫ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে গড় নির্বাচনী ব্যয় অনেক বেশি, অনেকে কোটি কোটি টাকা নির্বাচনে বিনিয়োগ করেন। বস্তুত, রাজনীতি আজ আমাদের দেশে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের গণতন্ত্র হয়ে গিয়েছে, বেস্ট ডেমোক্রেসি মানি ক্যান বাই। আর আমাদের জাতীয় সংসদ পরিণত হয়েছে ব্যবসায়ীদের আখড়ায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরোণের জন্য আইনের সংশোধন ও নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ জরুরি।

নির্বাচন কমিশনের বর্তমান করণীয়

প্রস্তাবিত সংস্কার ধারণাগুলো একত্রিত এবং চূড়ান্ত করা নির্বাচন কমিশনের সামনে আজ এক বড় করণীয়। সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করার পর এগুলো নিয়ে কমিশনের রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে বসতে হবে। এসব সংলাপে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও তার সহযোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য অবশ্য কমিশনকে তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে, যা হবে কমিশনের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

বিএনপি এবং তার শরিকরা নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবে কি-না তা অবশ্য পরিপূর্ণভাবে কমিশনের ওপর নির্ভর করে না, বরং তা বহুলাংশে নির্ভর করে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীদের ওপর। তত্ত্বাবধায়ক/অন্তবর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে বিরোধী দল কমিশনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না বলেই আমাদের আশঙ্কা। তাই কমিশন আমাদের বিরাজমান অসহযোগীতা ও কলহপ্রবণ রাজনীতির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

নির্বাচন কমিশনের সামনে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জের উৎস হল নির্বাচনী আইন মানার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের বিরাজমান সদিচ্ছার অভাব। আমাদের দেশে আইন মানার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক দলগুলোও আইন মানে না। উদারণস্বরূপ, নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজনেতিক দলের নিবন্ধনের অন্যতম শর্ত হল দলের অঙ্গ/সহযোগী সংগঠন ও বিদেশি শাখার বিলুপ্তি। জাতীয় সংসদে পাশ করা আইনে এসব বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এগুলো পুরোপুরি উপেক্ষা করে আসছে। এব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিতে গেলে কমিশন দলগুলোর রক্ত চক্ষুর সন্মুখীন হয়। তাই কমিশনকে সফল হতে হলে তাদেরকে কঠোর এবং দলগুলোকে আইন মানতে বাধ্য করতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ/সহযোগী সংগঠনের, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ/সহযোগী সংগঠনের তান্ডবে আজ সারা দেশে একধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রলীগের বাড়াবাড়ির কাছে আমাদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা জিম্মি হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দলের বৈদেশিক শাখার বিশৃঙ্খল আচরণের কারণে বর্হিবিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে। এমতাবস্থায় নতুন কমিশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হতে পারে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী আইনগুলো প্রয়োগের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগী ভুমিকা নেওয়া।

আমাদের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ প্রদানের বিধি বিধান সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে, গত ৪০ বছরেও যা বাস্তবায়িত হয়নি। বিগত নির্বাচন কমিশন এলক্ষ্যে একটি আইনের খসড়া তৈরি করে রেখে গিয়েছে, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন কমিশনের সামনে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, আইনটি পাশ করার ব্যাপারে সরকারকে রাজি করানো। এর ফলে ভবিষ্যতে কমিশনে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন আমাদের সামনে। বিভক্ত দুটি ঢাকা সিটি করপোরেশন যার অন্যতম। জেলা পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করাও জরুরি। এসব নির্বাচন নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করাও কমিশনের সামনে গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যালেঞ্জ।

আমাদের বেশ কয়েকটি নির্বাচনী আইন ইংরেজিতে। বিশেষত মূল নির্বাচনী আইন আরপিও ইংরেজি ভাষায় রচিত। এগুলোর বাংলা করা জরুরি। প্রসঙ্গত, আমরা সুজনের উদ্যোগে আরপিওর একটি অনুবাদ করেছি, যা গত নির্বাচনের আগে প্রকাশও করা হয়েছিল।

উপসংহার

বিগত নির্বাচন কমিশন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও দূরূহ কাজ করে গিয়েছে, যার অন্যতম হল ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন। রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কার, প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ, কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এছাড়াও বিগত কমিশন একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থের সংস্থানও করে গিয়েছে। উপরন্তু নির্বাচনী আইনের অধিকতর সংস্কারের লক্ষ্যে তারা কিছু হোম ওয়ার্ক করে কিছু নতুন সংস্কার প্রস্তাবও রেখে গিয়েছে। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও আমাদের কিছু প্রস্তাব রয়েছে। এসব প্রস্তুতি নতুন সুযোগের সৃষ্টি করেছে এবং পুনর্গঠিত কমিশনের কাজকে সহজ করে দিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এসব অগ্রগতির ওপর দাঁড়িয়ে নতুন কমিশনকে এখন সততা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে সামনের দিকে এগুতে হবে। আমরা তাদের সফলতা কামনা করি।